অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতা, পরিচয়ের রাজনীতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র
আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠী পরিপ্রেক্ষিত

আইনুন নাহার

এই প্রবন্ধে আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিচয় নির্মাণ এবং পরিবেশন কেন ও কীভাবে সমস্যাজনক তা মূলত খতিয়ে দেখা হবে। তা ছাড়া বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিম জামাত নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সময়ে সময়ে যে সংঘবদ্ধ সহিংস আক্রমণ করা হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করা হবে। ঐতিহাসিক দিক থেকে কখন, কোন প্রেক্ষাপটে, কোথায় ও কীভাবে এগুলো করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হবে। তার সাথে সাথে বাছাইকৃত কিছু ঘটনার আলোকে অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে তার অবস্থানের স্বরূপ তুলে ধরা হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, মানবাধিকার ও রাষ্ট্র– এ বিষয়গুলোর পারস্পরিক যোগাযোগকে বিশদভাবে অনুসন্ধান করাও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলমান এখানে বাস করে– এই তথ্যটিকেই সাধারণত সামনে নিয়ে আসে রাষ্ট্র (নাহার, ২০০৮)। এ রকম প্রচলিত ডিসকোর্সে উহ্য থেকে যায় যে, বাংলাদেশের মুসলমান আসলে সমগোত্রীয় কোনো জনগোষ্ঠী নয়। বরং ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই জনগোষ্ঠী মোটা দাগে শিয়া ও সুন্নি নামে দুই ভাগে বিভক্ত। আবার এই মুসলমান দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুন্নিরা কর্তৃত্বশীল হলেও তাদের নিজস্ব পরিচয়কে কেন্দ্র করেও রয়েছে নানাবিধ বিভাজন, নানা ধরনের টানাপড়েন। তাদের এই বিভাজন কেবল পরিচয়ের ভিন্নতাকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কে 'প্রকৃত সুন্নি', এমনকি কে 'প্রকৃত মুসলমান' কিংবা 'মুসলমান নয়', সেই গণ্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য কথায়, পারস্পরিক আন্তঃধর্মীয় বিরোধিতা এ ক্ষেত্রে একটি প্রকাশ্য বাস্তবতা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন 'ইসলামি দল/সংগঠনসহ ব্যক্তি পর্যায় থেকেও আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করার দাবি উঠছে। আর এ দাবি অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতারই একটি উদাহরণ। এই অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতা নিশ্চিত করে, আহমদিয়া জনগোষ্ঠী যেভাবে ইসলাম ও মুসলমান পরিচিতি ধারণায়ন করে, তা 'প্রবল/কর্তৃত্বশীল' সুন্নিদের কাছে স্বীকার্য নয়। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ আহমদিয়া মুসলমান ইস্যুতে এযাবৎকালে রাষ্ট্রের অবস্থানও প্রকারান্তরে একই ধরনের মনোভাবকেই জাহির করে। যদিও রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করার দাবিকে সরাসরি বাস্তবে রূপ দেয়নি।

এসব বাস্তবতা বিবেচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের অর্থ এবং খোদ মুসলমান হওয়ার অর্থ কমবেশি একই রকমভাবে এখন পর্যন্ত প্রতীয়মান হয়নি। আর তারই রেশ/ধারাবাহিকতা 'প্রবল' সুন্নি মুসলমান বনাম আহমদিয়া মুসলমান সংশ্লিষ্ট বিতর্কে দেখা যায়।

মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি নির্মাণ এবং পরিবেশন : অন্তর্নিহিত অর্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট সংকটসমূহ

আমি এখানে ধর্মীয় পরিচয় প্রশ্নে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নিজেকে মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে প্রথাগত পরিবেশনের যে প্রবণতা, সেটাকে সমস্যাজনক বলে অভিহিত করতে চাই। কেননা এ ধরনের পরিচয় নির্মাণ ও পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে বিরাজমান ধর্মীয় পরিচয়ের বৈচিত্র্য ধরা পড়ে না। ফলে অধিপতিশীল ধর্মীয় মতাদর্শের নিজের মাঝে বিদ্যমান অধিপতিশীল প্রান্তিক (যেমন–প্রবল সুন্নি মুসলমান বনাম আহমদিয়া মুসলমান)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বাস্তবতাকে পাঠ করার সুযোগ থাকে না।

বৈশ্বিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় দেখা যায় যে ইসলাম ও মুসলমান পরিচয়ের ব্যাখ্যা কোনো স্থিতিশীল বা অনড় বিষয় নয়। আর বিশেষত বাংলা অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায় সূচনাকাল থেকেই বিষমগোত্রীয় ছিল (আহমেদ, ১৯৮১: ২-৭, ৩২-৩৫)। এখানে ইসলাম ও মুসলমান সংশ্লিষ্ট ধারণায়নের ক্ষেত্রে নানা সময়ে নানা পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে (যেমন– স্থানীয় মুসলিম বনাম বহিরাগত মুসলিম, আশরাফ মুসলিম বনাম আতরাফ মুসলিম, শিয়া মুসলিম বনাম সুন্নি মুসলিম, বাঙালি মুসলমান বনাম বাংলাদেশি মুসলমান প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট তর্ক-বিতর্ক)। তাই এসব বাস্তবতা বিবেচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের অর্থ এবং খোদ মুসলমান হওয়ার অর্থ কমবেশি একই রকমভাবে এখন পর্যন্ত প্রতীয়মান হয়নি। আর তারই রেশ/ধারাবাহিকতা 'প্রবল' সুন্নি মুসলমান বনাম আহমদিয়া মুসলমান সংশ্লিষ্ট বিতর্কে দেখা যায়। এ রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হলো, নানা প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও মুসলমান পরিচয় যে নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় সেগুলোই আবার প্রকারান্তরে মুসলমান পরিচয় ও তার অর্থময়তা অনুসন্ধানের নিত্যনতুন তাগিদ তৈরি করে। আর এই তাগিদের ওপর ভিত্তি করেই ইসলাম ও মুসলমান পরিচয়ের মতো বিমূর্ত ধারণাগুলোকে ব্যাখ্যার চেষ্টা চলে। এ ধরনের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট হয় যে আদতে পরিচয়-পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত কোনো বাস্তবতাই স্থির কোনো কিছু নয়। নানা সময়ের নানা প্রেক্ষাপটে (বৈশ্বিক-রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক, স্থানিক-রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক) পরিচয়-পরিচিতির নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ঘটে আর তা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া।

অথচ বিদ্যমান বিষমগোত্রীয় সমাজের বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলমানকে একাকার করে মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে রাষ্ট্র সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়। ফলে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুসলমান জাতি হিসেবে সামষ্টিক/সাধারণ স্মৃতিকে বয়ান করার ক্ষেত্রে আবহমানতা অথবা অলঙ্ঘনীয়/অপরিহার্য সত্যকে একটা সামষ্টিক/সাধারণ দলের (Group) সাথে এমনভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়, যেন মনে হয় যে সামষ্টিক/সাধারণ দলের অন্তর্গত সকলের পরিচয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। এ রকম ডিসকোর্সের গুরুত্ব শুধু ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা ওই ডিসকোর্সের আড়ালে থাকা কর্তৃত্ব কিংবা বৈধতার সাথে

সম্পর্কিত (জাহাঙ্গীর ১৯৯৬: ৪২)। রাষ্ট্রীয় পরিসরে জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় পরিচয়, লিঙ্গীয় পরিচয় নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে একই ধরনের সামষ্টিক/সাধারণ পরিচয় ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রাধান্য পায় আর এভাবে বাস্তবে বিরাজমান সূক্ষ্মতর বহুবিধতার বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়। তাই পরিপ্রেক্ষিতভেদে সরলীকৃত সামষ্টিক/সাধারণ পরিচয় ও সাধারণ অভিজ্ঞতার তকমা সেঁটে যা কিছু বর্ণিত হয়, সেই ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে যা কিছু দাবি করা হয়, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান। আদতে কোনো কিছুর পরিবেশন সব সময়ই রাজনৈতিক, যার সাথে ক্ষমতার চর্চা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত (হল, ১৯৯৭)।

এ প্রসঙ্গে ডেভিস (১৯৯৭: ১৬) বলেন যে সামষ্টিক/সাধারণ (Collective)-এর জন্য একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিবেশন দাবি করাটা জাতীয়তাবাদী প্রকল্প এবং ডিসকোর্সের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, পরিচয়, স্মৃতি, অভিজ্ঞতাকে দেখার ক্ষেত্রে সেগুলোকে যখন সামষ্টিক/সাধারণ স্মৃতি, অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়, তখন তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান বাস্তবতার সরলীকরণ ঘটে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ধরনের বাস্তবতার একাধিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে অসহিষ্ণু। অথবা বলা যেতে পারে, পরিপ্রেক্ষিতভেদে বাস্তবতার মধ্যে বিদ্যমান নানা ধরন-ধারণ, অর্থময়তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে পারে না/ধারণ করতে চায় না। পাশাপাশি এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত ঘটনাবলিকে পৌরাণিক আদর্শের ছাঁচে বেঁধে ফেলে। এটাই এর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্য কথায়, ঘটনাপ্রবাহ/বাস্তবতাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন কোনোকালেই এগুলোতে কোনো ছেদ পড়েনি, কখনো কোনো টানাপড়েনের জন্ম হয়নি। বরং তা আবহমান কাল থেকে একই রকমভাবে বিদ্যমান, যেন সব মানুষজন একই রকম অভিজ্ঞতাকে একইভাবে ধারণ করে (নভিক, উদ্ধৃত পান্ডে, ২০০১; গুহ, ১৯৯৬)।

রাষ্ট্র পুরো জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট ইতিহাস নির্মাণ করে এবং সেটাকেই 'জাতির ইতিহাস' হিসেবে বর্ণনা করে, যা জাতির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন (গুহ, ১৯৯৬)। ধর্মীয় পরিচয়কে ঘিরে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্যের সরলীকরণের মধ্য দিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও ঠিক একই ধরনের বাস্তবতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আদতে রাষ্ট্র মাত্রই বহুবিধতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে; প্রবল গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে। কিন্তু পরিচয় প্রশ্নে অনুসৃত এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তখনই আরো সমস্যাজনক হয়ে ওঠে, যখন প্রবল পরিচয়ের অন্তর্গত মানুষজন তাদের অপর/অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ পরিচয়ের তকমা দিয়ে তাদের কোণঠাসা করতে চায়। আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিরা তাদেরও অমুসলিমের লেবাস পরাতে চায়, তখন তাতে কিন্তু পূর্ব থেকে বিদ্যমান বহুবিধতাকে দেখতে না পাওয়ার, না চাওয়ার অভ্যস্ততার চরম প্রতিফলনই ঘটে।

বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিম জামাত এবং অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতার প্রেক্ষাপট

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হচ্ছেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৬৪-৬৫ সালে স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দর্শনলাভের দাবি করেন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ার বিষয়ে কিছু ইলহাম প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ হজরত মির্জা গোলাম আহমদের কাছে ভারতের লুধিয়ানা শহরের ৪০ জন ব্যক্তির বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের মাধ্যমে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। মহানবী (সাঃ)-এর 'আহমদ' নামানুসারে এই জামাতের নাম রাখা হয় আহমদিয়া মুসলিম জামাত, যা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১০,০০০ এরও বেশি শাখায় বিভক্ত। এদের মূল কার্যালয় ইংল্যান্ডে অবস্থিত। বাংলাদেশে (তৎকালীন ভারতবর্ষের অংশ) ১৯১২ সালে আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার আগেই এ অঞ্চলে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বিস্তার ঘটেছে। বিগত এক শ বছরে এই জামাতের সদস্যসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে এবং বর্তমানে তা এক লাখ কিংবা তারও বেশি হতে পারে, যা আমাদেরকে এই জামাতের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান গবেষণা-মাঠকর্ম চলাকালে (২০০৮-১১) জানান। তাঁর মতে, এই সংখ্যা যেহেতু প্রতিদিনই বাড়ছে, সেহেতু একেবারে সঠিক সংখ্যাটা উল্লেখ করা দুরূহ। ঢাকা ছাড়াও সাভার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা, সাতক্ষীরা, রংপুর, পঞ্চগড় প্রভৃতি স্থানে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষজন রয়েছে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ব্যক্তিবর্গের সাথে আমাদের সরাসরি সাক্ষাৎকালে তারা আহমদিয়া মুসলিম হিসেবে প্রজন্মান্তরে অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলার সময় স্পষ্ট করেন যে শুরুর সময় থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে আহমদিয়া মুসলিম বিরোধিতা চলে এসেছে; ধর্ম-দর্শন ও চর্চা নিয়ে মতপার্থক্য এই বিরোধিতার অন্যতম পটভূমি। আহমদিয়া মুসলিম বিরোধীদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, তারা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী বলে মানেন না, আরবি 'খাতামান্নাবিঈন'-এর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তাঁরা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করেন। অথচ প্রবল সুন্নি বিশ্বাস অনুযায়ী, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না।

আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন দেশভাগ পরবর্তী সময়কালের প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা লাভ করে, যখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কার্যকর কৌশলে রূপান্তর করা হয়।

আহমদিয়া জামাতের সদস্যরা আমাদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে কোরআন, সুন্নাহ ও হাদিসকে তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁরা মনে করেন, মৌলিক ইসলাম নিয়ে অন্যদের সাথে তাঁদের তফাত নেই। তাঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ এক এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। কিন্তু আরবি শব্দ 'খাতামান্নাবিঈন' কেবল শেষ নবী বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং এর আরো অর্থ বিদ্যমান বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু প্রবল সুন্নিরা এই ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করে। এ বিষয়টি ছাড়াও হজরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু, ইমাম মাহাদির আগমন, ইসলামি খেলাফত, জিহাদ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা নিয়েও মতবিরোধিতা বিদ্যমান। আবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চর্চার ক্ষেত্রে কোন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের চর্চা ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত আর কোনগুলো সমর্থিত নয়–এ নিয়েও আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় ও প্রবল সুন্নি মুসলমানদের মতভেদ/মতবিরোধ বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আহমদিয়া মুসলিমরা শবেবরাতের দিন রুটি-হালুয়া বিলানোর প্রথাটি পালন করেন না। তারা কুলখানি, মিলাদ পড়ানো, মাওলানা ও পীর-ফকিরকে পয়সা দিয়ে কোরআন খতম পড়ানো প্রভৃতির চর্চাকে খারিজ করেন, তারা এসব বিষয়কে নিরুৎসাহিত করেন। এগুলোকে 'প্রকৃত ইসলাম ধর্ম-চর্চা'র সাথে স্থানিক লোকাচারের মিশ্রণ বলে খারিজ করেন।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় ও প্রবল সুন্নি মুসলমানদের মতভেদ/মতবিরোধ ইসলাম ধর্মের নানা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র বিদ্যমান বিষয়টি এমন নয়। এই মতবিরোধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চর্চার ক্ষেত্র ঘিরেও আবর্তিত। প্রবল

সুন্নি মুসলমানরা আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষজনের সাথে নিজেদের পার্থক্য টানার ক্ষেত্রে সাধারণত উভয়ের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা নিয়ে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহকে তুলে ধরে। এ ধরনের পার্থক্যগুলো তুলে ধরার মধ্য দিয়ে তা যে কেবল আহমদিয়া মানুষজন সম্পর্কে নানা ডিসকোর্স উৎপাদন অবধিই ক্ষান্ত থাকে তা নয়। বরং এ ধরনের ডিসকোর্সগুলো এই জনগোষ্ঠীর 'অপরীকরণ' প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে, যা আবার তাদের জীবনে নানা ধরনের প্রান্তিকতা তৈরিতেও প্রভাব ফেলে। সে যা-ই হোক, এই প্রবন্ধে আহমদিয়া মুসলিমদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বমূলক অবস্থানের বিষয়টি খতিয়ে দেখার দিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার কারণে অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতার প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করার চেয়ে বরং পরবর্তী আলোচনায় মূলত অন্তঃধর্মীয় বিরোধিতায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আহমদিয়া সম্প্রদায় বিরোধী আন্দোলন ও কর্মকাণ্ড: ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র

প্রথাগত আলোচনায় আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে পাকিস্তানকে বর্ণনা করা হয় আর সে কারণে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বোঝা ও বিশ্লেষণের জন্য এর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে ভারত ও পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) নামক আলাদা দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হলো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান। তবে সেখানেই প্রথম তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়েছে, বিষয়টি এ রকম নয়। এই বাস্তবতা কমবেশি ব্রিটিশ সময়কাল থেকেই চলমান। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উত্থানকে বিবেচনা করা হয় ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলমানদের জিহাদি মনোভাবকে দাবিয়ে দেওয়ার সুপরিকল্পিত কৌশলের অংশ হিসেবে (আহমেদ, ১৯৯৪)। সুসংগঠিত সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আহমদিয়া মুসলিমদের সমাজে, রাষ্ট্রে কোণঠাসা করা এবং পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই জনগোষ্ঠীকে নাগরিকের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া ব্রিটিশ সময়কাল থেকেই চলে আসছিল। আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন দেশভাগ পরবর্তী সময়কালের প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা লাভ করে, যখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কার্যকর কৌশলে রূপান্তর করা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিসরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে প্রবল ধারায় নিয়ে আসার মানসিকতা থেকে এই আন্দোলনকে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে খাটানোর পন্থা অবলম্বন করা হয়।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে মজলিস-এ-আহরার ও জামায়াতে ইসলাম আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করার দাবিতে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। মজলিস-এ-আহরার ও জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যথাক্রমে মৌলভী আতাউল্লাহ শাহ বোখারী ও মওদুদী। উল্লেখ্য, দুটি দলেরই উৎপত্তিস্থল বর্তমান ভারত। দেশভাগের প্রস্তাবে দুটি সংগঠনই পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে উভয় দলের নেতৃবৃন্দই সেখানে চলে আসেন। তবে আগের দেশভাগবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে নতুন রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের সাথে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়। এ দুই দল সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানের আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে এবং সেখানে শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত গড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তারা এই জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকীকরণের নিয়মিত প্রচেষ্টা চালালেও ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কোনো সাফল্য পায়নি, যা আবার প্রকারান্তরে তাদের রাজনৈতিক ভিত্তিকে পাকিস্তানে দুর্বল করে রাখে। তবে ১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও আমির মওদুদী 'কাদিয়ানী মাসালা' নামের বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে যখন আহমদিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামবিরোধী বিশ্বাস ও ইসলাম ধর্ম বিকৃতির অভিযোগ আনেন, তখন থেকেই মূলত সুসংগঠিতভাবে আহমদিয়া বিরোধিতা শুরু হয় এবং তাদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবিতে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ফলে মজলিস-এ-আহরার ও জামায়াতে ইসলাম পাকিস্তানের জনপরিসরে রাজনৈতিক বৈধতা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-তে শুরু হওয়া আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়। এই দাঙ্গায় প্রায় ২০০০ লোক নিহত হয় এবং পরিস্থিতি সামলাতে পাঞ্জাবে মার্শাল ল জারি করা হয়। এটিই পাকিস্তানের ইতিহাসে জারীকৃত প্রথম মার্শাল ল।

পরবর্তীকালে পাঞ্জাব প্রাদেশিক সরকার এই ঘটনার অনুসন্ধান ও বিচারের জন্য 'মুনির-রাও কমিশন' গঠন করে। এই কমিশন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ঘটনার জন্য জামায়াতে ইসলামের আমির মাওলানা মওদুদীকে প্রধানত দায়ী করে ফাঁসির রায় ঘোষণা করে। তবে পরে আরববিশ্বের চাপে পাকিস্তান সরকার এ রায় বাতিল ঘোষণা করে।

১৯৫৪ সালে মজলিস-এ-আহরার-উল-ইসলামের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মজলিস-ই-তাহাফুয-এ-খতম-ই-নবুওয়াত নামে বিকল্প সংগঠন তৈরি করা হয়। এই সংগঠনের সদস্যরা আবার আলামি মজলিস-ই-তাহাফুয-এ-খতম-ই-নবুওয়াত নামের প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী নানা স্থানে আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য। জামায়াতে ইসলাম পাকিস্তান ও মজলিস-এ-আহরার ক্রমাগত আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের মুখে ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো সাংবিধানিকভাবে আহমদিয়া মুসলিমদেরও 'অমুসলিম' সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করে। তবে পাকিস্তানের অনেক আগে ১৯৩০ সালে মরিশাস বিশ্বে প্রথমবারের মতো আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৯৭৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাও আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করে এবং সৌদি আরব তাদের নির্বাসন প্রদানের বিধান তৈরি করে। আবার ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হক এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কেউ আহমদিয়া হিসেবে দীক্ষিত হলে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডাদেশের ব্যবস্থা করে ব্লাসফেমি আইন পাস করেন, যা এখনো বলবৎ রয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তানে আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের মূল পৃষ্ঠপোষক হলো মুত্তাহিদা মজলিস-এ-আমল নামের একটি জোট। এই জোটের প্রধান দল হচ্ছে জামায়াতে ইসলাম পাকিস্তান।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আহমদিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে আহমদিয়াবিরোধী যে আন্দোলন চলছে, তা মূলত বিশ্বব্যাপী এই জনগোষ্ঠীবিরোধী চলমান আন্দোলনের অংশমাত্র। ১৯৮০-র দশকের শেষ ভাগ থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট বাংলাদেশ' নামের সংগঠনটি আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসছে। তবে সংগঠনটি

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-তে শুরু হওয়া আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়। এই দাঙ্গায় প্রায় ২০০০ লোক নিহত হয় এবং পরিস্থিতি সামলাতে পাঞ্জাবে মার্শাল ল জারি করা হয়। এটিই পাকিস্তানের ইতিহাসে জারীকৃত প্রথম মার্শাল ল।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকের শেষ ভাগে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর বিরোধিতা ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান হতে শুরু করে ১৯৮০-র দশকেই। এই বিরোধিতাকে পূর্ববর্তী সময়ের সুনির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত করে দেখা যেতে পারে।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে বিশ্ব মানচিত্রে। যথারীতি রাষ্ট্রটির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে চারটি মূলনীতির একটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৭২ সালে। তবে ১৯৭৫ সালের পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষত সংবিধানে ক্রমান্বয়ে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবির্ভূত সাবেক সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সংবিধানের সেক্যুলারিজম শব্দটি প্রত্যাহার করেন। তার বদলে যুক্ত করেন 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে আরেক স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইসলাম ধর্মাবলম্বী তথা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়ে কেবল অপরাপর ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য প্রান্তিকতার নতুন অর্থ তৈরি করা হয় তেমনটা নয়। খোদ ইসলাম ধর্মানুসারীদের নিজেদের মাঝে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন মত, দৃষ্টিভঙ্গিও সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতাপে কোণঠাসা হওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে চলমান আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলন, সহিংস কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করতে হলে এই বিশেষ রকমের প্রান্তিকীকরণের সাথেই মিলিয়ে দেখতে হবে।

ঢাকাসহ বাংলাদেশের নানা স্থানে নানা সময়ে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবিতে ১৯৮৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থানীয় ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন তাদের কার্যক্রম শুরু করে। মাঠপর্যায়ের গবেষণার সময়ে তথ্যদাতাদের বয়ান থেকে জানা যায় যে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা আহমদিয়া মুসলিমদের বিভিন্ন মসজিদে আক্রমণ চালায় এবং ৬টি আহমদিয়া মসজিদ দখল করে নেয়। এটাই প্রথম নয়। ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদিয়াবিরোধী উদ্যোগ (যেমন–আহমদিয়া মুসলিম কোনো ব্যক্তিকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করতে না দেওয়া, পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি) পরিলক্ষিত হয় (হাসান, ২০১১: ৭৪)। সংঘবদ্ধভাবে এই ধরনের প্রতিহিংসামূলক, সহিংস কর্মকাণ্ড আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে।

ঢাকাসহ বাংলাদেশের নানা স্থানে নানা সময়ে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবিতে ১৯৮৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থানীয় ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

তথ্যদাতারা আরো জানান, ১৯৮৭ সালের পর আবার ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি খতমে নবুওয়াত ও খিলাফত ছাত্র আন্দোলনের পরিচয়ে খুলনায় আহমদিয়া মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। একই বছরের ২৯ অক্টোবর খতমে নবুওয়াত আন্দোলনকারীরা বকশীবাজারস্থ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রধান কার্যালয়ে বোমা হামলা চালানোসহ তাদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় মসজিদে আসরের নামাজের জন্য অপেক্ষারত আহমদিয়া মুসল্লিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সহিংস আক্রমণ করে এবং এতে ৩০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়। এ ছাড়া আক্রমণকারীরা সহস্রাধিক বই ও কোরআন শরিফসহ সমৃদ্ধ পাঠাগার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শুধু 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট বাংলাদেশ' সংগঠনটিই যে কেবল আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' বলে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এমনটা নয়, বরং তাদের সাথে সাথে নানা সময়ে বাংলাদেশের বেশ কিছু ইসলামি দল বা গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও (যেমন–ইমাম, মাওলানা প্রমুখ) প্রকাশ্যে সহমত পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিরোধী খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বাংলাদেশে দেড় যুগের বেশি সময় বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে নিয়মিত বিরতিতে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। একক কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করেনি। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন এই আন্দোলনে ভূমিকা রাখলেও তারা মূলত ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষত তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে (২০০১-০৬) আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী সহিংস কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামী ঐক্যজোট এবং অন্যটি জামায়াতে ইসলামী– এ দুটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় (হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০০৫ : ২)। তবে আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর নাম ও সম্পৃক্ততার বিষয়টি জোরেশোরে আলোচিত হয় না, তারা তাদের সম্পৃক্ততার বিষয় তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করে না। তার পরও বাংলাদেশে মূলত ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদেই দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকীকরণে ঠেলে দিয়েছে।

বাংলাদেশে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার চর্চা হয়ে আসছে বহুদিন থেকেই। তবে সংঘবদ্ধভাবে, মুখ্যত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, সহিংসতা চর্চার বিস্তার (যেমন–হুমকি, একঘরে/সামাজিকভাবে বয়কট করা থেকে শুরু করে প্রাণনাশ পর্যন্ত) নিঃসন্দেহে আহমদিয়া সম্প্রদায় বিরোধিতার ধারায় গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তিকে শুরুর দিকে পরিবার, বৃহত্তর সমাজ/কমিউনিটি থেকে যেভাবে প্রান্তিক করা হতো (একঘরে/সামাজিকভাবে বয়কট করা), তার সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় রাজনীতির নতুন কৌশল। আরো স্পষ্ট করে বললে, ধর্মীয় অনুভূতির রাজনৈতিকায়নের ফলে প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এতে এই জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতাকে আরো প্রকট করেছে বা করে তুলেছে।

১৯৮৭ সাল থেকে আহমদিয়াদের 'অমুসলিম' ঘোষণার দাবি চলে এলেও বাংলাদেশের কোনো সরকার এখনো তা বাস্তবে কার্যকর করেনি। ১৯৯৩ সালে দায়ের করা এক রিট পিটিশনে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার কেন কাদিয়ানীদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করবে না। তার উত্তরে বাংলাদেশ হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে রাষ্ট্রধর্মের পবিত্রতা রক্ষার নামে কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করার কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার কিংবা ক্ষমতা–কোনোটাই রাষ্ট্রের নেই (হাসান, ২০১১: ৭৭-৭৮)। তবে এটাও সত্য, এ বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষমতাসীন দলকে আজ অবধি শক্তপোক্ত অবস্থান নিতেও দেখা যায়নি। উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষণীয়।

১৯৭৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নানা সময়ে, নানা স্থানে সংঘটিত সহিংসতার কমপক্ষে একটি ঘটনার ক্ষেত্রেও এখন পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন হয়নি। বরং এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নানা

তরফ থেকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদানের ঘটনা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ২০০৩ সালের অক্টোবরে যশোরে স্থানীয় আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর সভাপতি ও ইমাম শাহ আলম আহমদিয়াবিরোধী সংগঠিত আন্দোলনের কারণে সহিংস আক্রমণের শিকার হয়ে নিহত হন। জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থাকা সত্ত্বেও হত্যাকারীদের শাস্তির আওতায় আনা হয়নি (পূর্বোক্ত, ২০০৫)।

আবার ২০০৪ সালে তৎকালীন জোট সরকার জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের দাবি অনুযায়ী আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' ঘোষণা না করলেও, তাদের অন্য একটি দাবি মেনে নিয়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (পূর্বোক্ত, ২০০৫)। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সাংগঠনিক পর্যায়ের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়ে এ প্রসঙ্গে অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পরে একজন আহমদিয়া ও কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন কর্তৃক আপিল করলে আদালত একটি স্থগিতাদেশ জারি করে। আর আহমদিয়াদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপটিকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে পরিস্থিতি শান্ত করার কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে রাষ্ট্রীয় এই কৌশল একটি সমস্যাজনক প্রক্রিয়া। পরিস্থিতি শান্ত করার অজুহাতে যা কিছুই বলা আর করা হয় না কেন, সেখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে তা শেষ পর্যন্ত কার বা কাদের স্বার্থ রক্ষা করে? প্রকৃতপক্ষে এই কৌশলগত অবস্থানের কারণে রাষ্ট্র সব সময়ই কোনো না কোনোভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবল জনগোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বন করে। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপরই ভোগান্তির খড়্গটা নেমে আসে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, এই রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা প্রদানে বাধ্য। অন্যদিকে অপরাপর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করার শর্তে প্রতিটি নাগরিকের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

আহমদিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সময়ে আহমদিয়া মসজিদগুলোতে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করলেও ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। ২০০৫ সালের ১৭ এপ্রিল সাতক্ষীরায় আহমদিয়া জনগোষ্ঠী ও মসজিদগুলোতে হামলা চলাকালে এলাকায় ও মসজিদগুলোর সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আক্রমণকারীরা মসজিদে আহমদিয়াদের ওপর হামলা করতে এবং একটি সাইনবোর্ড লাগাতে এলে পুলিশের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডার সূচনা হয়। একপর্যায়ে আক্রমণকারীদের সাথে পুলিশ রফায় আসে এই শর্তে যে তারা ওই সাইনবোর্ডটি আহমদিয়াদের মসজিদের সামনে টাঙিয়ে দেবে। পুলিশ আহমদিয়াদের মতামত উপেক্ষা করে সাইনবোর্ডটি টাঙিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যেখানে লেখা ছিল :

এটা কাদিয়ানী উপাসনালয়। কোন মুসলমান মসজিদ মনে করে ভুলে প্রবেশ করবেন না (পূর্বোক্ত, ২০০৫: ৩৯-৪০)।

আমাদের সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে একজন আহমদিয়া মুসলিম তথ্যদাতা এ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে মন্তব্য করেন, এ ধরনের একটি কাজকেও তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার একটি কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। তিনি সেদিনের ওই ঘটনায় আক্রমণকারীদের সাথে পুলিশের রফা হিসেবে তাদের মসজিদের সামনে টাঙানো সাইনবোর্ডে ব্যবহৃত ভাষার দিকটি তুলে ধরে বলেন :

বাংলাদেশের বেলায়, বাংলা শব্দ ব্যবহার করার বেলায় 'উপাসনালয়'–এই শব্দটির তো একটা নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। 'উপাসনালয়' শব্দটি তো হিন্দুরা ব্যবহার করে তাদের উপাসনার স্থানকে বোঝাতে। আমরা মুসলিমরা তো উপাসনা করি না, ইবাদত করি, আর সেই ইবাদতের স্থান হল মসজিদ। আমাদের মসজিদের সামনে যখন সাইনবোর্ড লাগিয়ে সেটাকে 'উপাসনালয়' বলা হয়, তখন তা কি আর আমাদেরকে মুসলিম বলে ভাবায়, মুসলিম বলে মানে? আমরা কি তাহলে হিন্দু? আমরা তো হিন্দু নই, আমরা তো নিজেদেরকে হিন্দু মনে করি না...

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাতক্ষীরায় এ ঘটনাটি ঘটার পূর্বে হুবহু প্রায় একই রকমের ঘটনা ঘটেছিল বগুড়ার সেঁউজগাড়িতে ১১ মার্চ ২০০৫ তারিখে। বগুড়ার এই ঘটনায় অংশ নেওয়া সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীদের ব্যাপারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কোনো মন্তব্য না করলেও ১৪ মার্চ ২০০৫ তারিখে জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এ ধরনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহল এবং দাতা সংস্থার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ তিনি অনুমোদন করবেন না বলে জানান। তিনি বিদেশি, আন্তর্জাতিক মহলকে উদ্দেশ করে মন্তব্য করেন যে বাংলাদেশের নিজস্ব সংবিধান ও আইন রয়েছে, আর তিনি সে অনুযায়ীই রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন (পূর্বোক্ত, ২০০৫: ৩৮-৩৯)। পর্যবেক্ষণকারীরা মনে করেন যে ওই আক্রমণে তার রাজনৈতিক জোটের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের সক্রিয় ভূমিকা থাকার কারণে তিনি ওই ঘটনায় কোনো নিন্দা জ্ঞাপন করেননি (পূর্বোক্ত, ২০০৫: ৩৯)। বগুড়ার ঘটনার এক মাস পর সাতক্ষীরা জেলায় একই রকমের ঘটনা ঘটার পাশাপাশি আহমদিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে সহিংসতার ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায় এবং নারী-পুরুষভেদে আহমদিয়া মুসলিমদের নির্বিচারে আক্রমণ করা হয়, শারীরিকভাবে জখম করা হয়; ঘরে ঘরে লুটতরাজ করা হয় (পূর্বোক্ত, ২০০৫: ৩৯-৪১)।

দুঃখজনক হলেও সত্য, ২০১১ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রবর্তিত হলেও আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। ২০১২ সালের ৭ নভেম্বর রংপুরের তারাগঞ্জে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে মসজিদ নির্মাণের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রেস রিলিজ থেকে জানা যায় যে ২৫ আগস্ট ২০১২ সালে তারা একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এবং ৪ অক্টোবর পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ছাড়াই কাজ চলছিল। কিন্তু ৫ অক্টোবর 'ধর্মীয় উগ্রপন্থী' লোকজন এসে মসজিদের নির্মাণকাজে বাধা এবং তারা আহমদিয়া মুসলিমদের বিভিন্ন ধরনের হুমকিও দেয়। এ রকম অবস্থায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আহমদিয়া মুসলিমদের এক মাসের জন্য নির্মাণকাজ বন্ধ রাখতে বলে এবং তারা এই অনুরোধ মেনেও নেয়। তার পরও 'ধর্মীয় উগ্রপন্থী'রা এলাকায় আহমদিয়াদের সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য প্রচার-প্রচারণা চালাতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ২৫ অক্টোবর তারা আহমদিয়াদের ঘরবাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করে এবং ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়, যেন তারা এই সময়ের মধ্যে তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে। অন্যথায় তাদের ঘর-দুয়ার ভেঙে সেগুলোতে আগুন দেওয়া হবে। ৭ নভেম্বর এই হুমকিগুলো কার্যকর করা হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয় সরকারের সাথে আহমদিয়া মুসলিমদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে সুন্নিদের মসজিদের দেড় মাইলের মধ্যে আহমদিয়া মুসলিমরা মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে না। ওই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ করেনি (প্রেস রিলিজ, নভেম্বর ২০১২)। স্থানীয় পর্যায়ের এই সহিংসতার ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার

বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তিনি সহিংসতার দায়ভার নিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থেকে এটিও সুস্পষ্ট হয়েছিল যে তিনি সাংবিধানিকভাবে আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' ঘোষণা করার পক্ষপাতী আর তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব তিনি স্থানীয় পর্যায়ে একটি ঈদ পুনর্মিলনী সভায় ব্যক্ত করেন (নিউ এইজ, ৮ নভেম্বর ২০১২)।

আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় পর্যায়ে আহমদিয়া মুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে নিরুৎসাহ করার প্রবণতা লক্ষণীয়। বরাবরই এ ক্ষেত্রে আহমদিয়া মুসলিমদের নিরাপত্তা ঝুঁকিকে মুখ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আহমদিয়া মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে ২০০৭ সালে ক্ষমতাসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরি অবস্থার কারণ দর্শিয়ে তাদের বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠান আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১০ ও ২০১১ সালেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। ২০১০ সালে কান্দিপাড়ায় অনুষ্ঠিত আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন থেকে অনেকগুলো শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, ইসলাম সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদান না করে তারা তাদের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারবে (দ্য ডেইলি স্টার, ২০ মার্চ ২০১০)। এ ধরনের শর্তের মধ্যে যে ব্যাপারটি প্রকারান্তরে সুপ্তাবস্থায় থাকে তা হলো, ইসলাম সম্পর্কে আহমদিয়া জনগোষ্ঠীর প্রচলিত ব্যাখ্যায় ভ্রান্তি বিদ্যমান, যা অন্যভাবে আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক অবস্থানের সমার্থক। আবার ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাজীপুরে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আয়োজনে স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে যে ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা হয়েছিল, তা উদাহরণ হিসেবে সংক্ষেপে আলোচিত হতে পারে। আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক পরিবেশিত একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বকশীবাজারের কেন্দ্রীয় মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় সেই বছর বার্ষিক জলসাটি গাজীপুরের রোভার স্কাউট পল্লীতে আয়োজনের জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসকের কাছে অনুমতি চায়। প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্পাদন শেষে তারা সেখানে ৬-৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি পায়। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলা হঠাৎ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের লোকজন এসে তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করে তাৎক্ষণিকভাবে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ প্রশাসন এ ধরনের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের পেছনে স্থানীয় পর্যায়ের নানা স্তরের মানুষজনের চাপ প্রয়োগকে দায়ী করেন। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, সে জন্য তাঁরা ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন বলে বিবৃতি দেন।

অথচ এ ঘটনার ১১ দিন পর একই স্থানে আয়োজিত একটি সিরাত মাহফিলে খোদ স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও এএসপি আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডায় অংশ নেন। বিশেষ এএসপি পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় জানান যে পূর্ববর্তী সপ্তাহে না বুঝে এই স্থানে আহমদিয়াদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আহমদিয়া মুসলিম বিরোধী সব ধরনের কার্যক্রমের সাথে একাত্মতাও ঘোষণা করেন। যেদিন আকস্মিকভাবে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়, সেদিন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা কী করেছিলেন জানতে চাইলে একজন তথ্যদাতা তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তৎক্ষণাৎ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা স্ব উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতি জানালেও বিরোধী রাজনৈতিক দল যাতে এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনকে জোরদার করতে না পারে সে জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তবে তারা যেন যথাশীঘ্র ওই স্থান থেকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনটি প্রত্যাহার করে নেন, সে ব্যাপারেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাদের অনুরোধ করে। একইভাবে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাজীপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর পুনরাক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্যবারের মতোই রাষ্ট্রের তরফ থেকে তাদেরকে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার 'সদুপদেশ' প্রদান করা হয়।

লক্ষণীয় যে প্রতিবারই রাষ্ট্র তার হস্তক্ষেপকে ব্যাখ্যা করেছে আহমদিয়াদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যুক্তিতে। প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব–এ বিষয়ের ওপর রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মূলত গুরুত্ব দেয়। এই দায়িত্বের ভলো-মন্দ নির্ণয় জরুরি না হলেও আহমদিয়াদের ব্যাপারে যে অবস্থান গ্রহণ কিংবা মনোভাব প্রকাশ করে, তা কোনোভাবে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভিত্তির সাথে খাপ খায় না। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, এই রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা প্রদানে বাধ্য। অন্যদিকে অপরাপর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করার শর্তে প্রতিটি নাগরিকের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে নাগরিকের অধিকার, নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ভাষা আপাত দৃষ্টিতে একই সাথে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানকে উপস্থাপন করে। তথাপি রাষ্ট্র যখন রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্যের বিধান দেখিয়ে তার নাগরিকের কোনো অধিকার হরণ করে, সব নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টিকে এক পাল্লায় মাপে না, তখন রাষ্ট্র প্রকারান্তরে তার পক্ষপাতমূলক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

২০০৪ সালে তৎকালীন জোট সরকার জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের দাবি অনুযায়ী আহমদিয়া মুসলিমদের 'অমুসলিম' ঘোষণা না করলেও, তাদের অন্য একটি দাবি মেনে নিয়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে

ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, মানবাধিকার ও রাষ্ট্র

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহমদিয়া মুসলিম ইস্যুতে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা সময়ে গৃহীত যে ধরনের কর্মকাণ্ড আলোচিত হলো, সেই কর্মকাণ্ডই প্রকারান্তরে নির্ধারণ করে দেয় : রাষ্ট্র সত্যি সত্যি ধর্ম-চর্চার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে অথবা কার ধর্ম-চর্চাকে নিরুৎসাহ করবে; কার অনুভূতিকে রাষ্ট্র গুরুত্ব/সমর্থন দেবে অথবা কার অনুভূতিকে রাষ্ট্র গুরুত্ব দেবে না/সমর্থন করবে না; সব নাগরিকের সমান অধিকার বলতে তাত্ত্বিকভাবে যা বিদ্যমান কিংবা মানবাধিকার বলতে যা বোঝানো হয়, তার কতটুকুই বা রাষ্ট্র গ্রাহ্য করবে/করবে না।

সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী অনুযায়ী, রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামকে জারি রাখা হয়েছে এবং আরবিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-কে সংবিধানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বজায় রাখার এ বিষয়টি আসলে অপরাপর সংখ্যালঘু/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যও রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। কেননা সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয় প্রশ্নে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই অবস্থান আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতার অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরো প্রলম্বিত আর জোরদার করার সুযোগ তৈরির সংকেত প্রদান করে। এটা এই অর্থে যে

রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলাম যখন স্বীকৃতি পায় তখন প্রশ্ন থেকে যায়, তা কোন ইসলাম এবং কাদের ইসলাম? অতি সাম্প্রতিক সময়ে হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবিনামার একটি হচ্ছে আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করা। হেফাজতে ইসলামসহ এই দাবিতে বিভিন্ন সময়ে সোচ্চার নানা 'ইসলামি' ব্যক্তি ও দল ইসলামকে রক্ষা করার কথা বলেন; সে ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন : কোন ইসলাম এবং কাদের ইসলাম রক্ষা?

সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর পর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বিভিন্ন মহলের আলোচনা-সমালোচনার দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে এই ভাবনার জায়গাজুড়ে মুসলিম বাদে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের পরিচিতি টানাপড়েন, নাগরিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটা আশঙ্কা এই মুহূর্তে বিরাজ করছে, তার বিপরীতে খোদ ইসলাম ধর্মের আন্তবিভাজন থেকে উদ্ভূত পরিচয়ের টানাপড়েনে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিক ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে কেউ এখনো ততটা উচ্চকিত নন।

ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে প্রান্তিক মানুষজনের বেলায় বাংলাদেশে যা ঘটছে তাকে শুধুমাত্র এই দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা হিসেবে ভাবার অবকাশ নেই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই। ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক পৃথক পরিসরের (প্রাইভেট বনাম পাবলিক) বিষয় হিসেবে দেখার ধারণা খুবই পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক এবং পাশ্চাত্যের আধুনিকীকরণ (পাশ্চাত্যকরণ) প্রকল্পের একটি অংশ। সাংস্কৃতিক হেজিমনির মতাদর্শিক রাজনীতির এই খোলসটা তখনই ভেঙে পড়ে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মমতের প্রশ্নে, ধর্মীয় আচরণের প্রশ্নে, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে বিবৃতি প্রদান এবং মন্তব্য জাহির শুরু করে (আসাদ, ১৯৯৩)।

আবার ধর্মীয় প্রান্তিকতা নিরসনে যখন ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করে ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর একতরফাভাবে জোর দেওয়া হয়, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ম ও মানবাধিকারের পারস্পরিক সম্পর্ককে পরস্পরবিরোধী বলে প্রতীয়মান করানো হয়। অথচ বাস্তবতা হলো, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে যেমন করে ধর্মীয় ব্যবস্থার উপাদান অস্তিত্বশীল, তেমনি ধর্মের মাঝেও এমন সব যুক্তিশীলতা বিদ্যমান, যেগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার বড়সড় নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে ধর্মীয় সহিংসতা, প্রান্তিকতা নিরসনের জন্য, মানবাধিকার রক্ষায় যেসব সাংবিধানিক আইন-কানুনের/নীতিমালার ওপর আমরা প্রায়শ জোরারোপ করি, সেগুলোকে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সাথে প্রেক্ষিতকরণপূর্বক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধ্যয়ন করা জরুরি।

প্রকৃতপক্ষে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভাষা-চয়নকারী রাষ্ট্র থেকে শুরু করে এমনকি খোদ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষেও আদতে ধর্মীয় সহনশীলতাকে শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আসাদের একটি মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ :

A secular state does not gurantee toleration; it puts into play different structures of ambition and fear. The law never seeks to eliminate violences since its objective is always to regulate violence (আসাদ, ২০০৩:৮).

আসাদের উপর্যুক্ত ভাষ্য অনুযায়ী যদি ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপকে বুঝতে চাই, তাহলে তা ইঙ্গিত দেয় যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কখনো সহনশীলতার নিশ্চয়তা দেয় না; বরং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও নানা ধরনের লক্ষ্য/আকাঙ্ক্ষা এবং সংকটকে তার নিজের মতো করে কাজে লাগায়। আর আইন কখনো সহিংসতাকে নির্মূল করার উপায় অনুসন্ধান করে না। কেননা খোদ আইনের উদ্দেশ্য হলো সহিংসতাকে সব সময় নিয়মতান্ত্রিকভাবে জারি রাখা।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বলা হয়, জনগণ তাদের সামষ্টিক ইচ্ছা থেকে তাদের আইন তাদের মতো করে তৈরি করে। কিন্তু যা বোঝা দরকার তা হলো, যেখানে কর্তৃত্ব নামের ব্যাপারটি চালু রয়েছে, তা সব সময়ই সমর্পণের সাপেক্ষে অস্তিত্বশীল। এখন সেই সমর্পণ জোর করেই কিংবা সম্মতির ভিত্তিতেই আদায় করা হোক না কেন। আইনের যে শক্তির কথা বলা হয় তা বাস্তবে নাগরিকসাধারণের ইচ্ছামাফিক চলতি কোনো বিষয় নয়। কেননা নাগরিক বলতে যে ধারণাকে সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়, সেখানে উহ্য থেকে যায় যে খোদ নাগরিক ধারণাটি কোনো সমগোত্রীয় শ্রেণিকে নির্দেশ করে না। আবার এটিও মাথায় রাখা জরুরি যে ইনক্লুশন আর এক্সক্লুশনের মতো বিষয়গুলো কেবল রাষ্ট্রের মতাদর্শিক ক্ষমতা-চর্চার অংশ হিসেবে দেখলে তা প্রান্তিকীকরণসংশ্লিষ্ট বাস্তবতার আংশিক পাঠকেই নির্দেশ করে। কেননা তখন তা রাষ্ট্রের সাধারণ্যের পরিসরে কিভাবে বিস্তার লাভ করে, টিকে থাকে, তা বোঝা যায় না। ইনক্লুশন, এক্সক্লুশনের মতো বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবন-চর্চার সাথে জড়িত (দাস ও পুল, ২০০৪ : ১৩)।

মানবাধিকার ইস্যুতে সব সময়ই সংবিধানকে রেফারেন্স/উল্লেখ্য হিসেবে সামনে এনে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এই কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব আছে এই বিচারে যে এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে তার মৌলিক দর্শনের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য বলা হয়। কেননা এর মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। আর রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধীপ্রবণ আচরণ প্রতিরোধে সংবিধানকে দৃশ্যপটে এনে রাষ্ট্রের ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয়। তবে মানবাধিকার প্রশ্নে আহমদিয়া মুসলিমদের অধিকারকে কেবল সংবিধান, রাষ্ট্রের আইনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিকে সমালোচনামনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পাঠ করার প্রয়োজন রয়েছে। এটা এ কারণে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজনের অনুভূতির দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে তার পক্ষপাতমূলক অবস্থানের বৈধতা দাঁড় করায়, তাতে রাষ্ট্র সংবিধানের লিখিত হরফ, বাক্যমালা, নিয়ম-নীতিকে ছাপিয়ে যায় :

It is this alien authority and not the written rule itself that constitutes the law of the state (আসাদ, উদ্ধৃত দাস ও পুল, ২০০৪: ২৮৭).

আসাদের মতে, রাষ্ট্রের এই এলিয়েন অথরিটি/কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান থেকে উৎসারিত নয়। আকারে-ইঙ্গিতে, খানিকটা বলে আর খানিকটা উহ্য রেখে রাষ্ট্র যে অলিখিত নীতি অনুসরণ করে, সেগুলোও রাষ্ট্রের আইনকে গঠন করে, সেগুলোও রাষ্ট্রের আইন-কৌশল হিসেবে চর্চিত হয়। রাষ্ট্রের এ ধরনের অলিখিত আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করাটা তাই গুরুত্বপূর্ণ। আহমদিয়াদের বাস্তবতাকে বিশ্লেষণে আসাদের এই পাঠের তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করি। এ ক্ষেত্রে যা যোগ করতে চাইছি তা হলো, রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান রাষ্ট্র-পরিচালক ও রাষ্ট্রের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালনার ধরন-ধারণকে নির্দেশ করে; লিখিত হরফে বলে দেওয়া হয় যে রাষ্ট্র ও জনগণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটুকু যেতে পারবে, কতটুকু পারবে না। তেমনিভাবে রাষ্ট্র যখন কোনো অলিখিত আইনকে অনুসরণ করে, চর্চা করে তখন তাতেও অলিখিতভাবে উল্লিখিত থাকে রাষ্ট্র ও জনগণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটুকু যেতে পারবে, কতটুকু পারবে না। রাষ্ট্রের এ ধরনের অলিখিত আইনের স্বরূপকে পাঠ করার প্রয়াস হলো মানবাধিকার, সমানাধিকারকে দৈনন্দিন জীবন-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করার প্রয়াস।

উপসংহার

টাইম ফর ইন্টেলেকচুয়াল অনেস্টিঃ দেয়ার আর ম্যানি ইসলামস্ (Time for Intellectual Honesty: There Are Many Islams) (২০০১) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে সাঈদ বলেন, ৯/১১ পরবর্তী বাস্তবতায়

আমেরিকা কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপকে সন্ত্রাসবাদ, স্বাধীনতার মতো বিমূর্ত ধারণাগুলোকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে বস্তুজাগতিক স্বার্থগুলোকে একভাবে যেমনি আড়াল করে, তেমনি এই ধরনের কার্যাবলির মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রতিদিন নতুন নতুন চেহারা পায়। সাঈদের এই ব্যাখ্যাকে ভিন্ন আঙ্গিক থেকে, অর্থাৎ স্থানিক পরিসরে রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় সম্পর্কিত করে দেখা যেতে পারে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করার মতো সংবেদনশীলতাসংক্রান্ত বিমূর্ত ধারণা ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও অধিপতিশীল বর্গ তাদের বস্তুজাগতিক স্বার্থগুলোকে আড়াল করে। অন্যদিকে কোনটি ইসলামি হিসেবে সমর্থন পাওয়ার যোগ্যতা রাখে আর কোনটি রাখে না, এমনটি বলার মধ্য দিয়ে স্থানিক পরিসরেও ইসলামের নতুন নতুন অর্থ নিত্যদিন উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়। আর এই অর্থ উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে আবার পরিচিতি-বর্গ হিসেবে মুসলিম-এর সংজ্ঞায়ন-পুনঃসংজ্ঞায়ন ঘটে।

আবার যা স্পষ্টত সামনে আনা প্রয়োজন তা হলো মানবাধিকার; মানুষ হিসেবে সমাজে, রাষ্ট্রে সমান অধিকার পাওয়ার বিষয়টি কেবল আইনি, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিষয় নয়; বরং এটি প্রাত্যহিক পরিসরে চর্চার সাথেও সংশ্লিষ্ট। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা এতে অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং এসব বাস্তবতার যোগসাজশেই আবার মানবাধিকার, নাগরিক অধিকারের মতো বিমূর্ত ধারণাগুলো তাদের নতুন নতুন অর্থ পরিগ্রহ করে, আর এই বাস্তবতা, স্থানিক থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরিসর আর বৈশ্বিক পরিসর থেকে শুরু করে স্থানিক পরিসর পর্যন্ত বিস্তৃত, আন্তঃসম্পর্কিত। রাষ্ট্র, ধর্ম ও পরিচিতি-রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের বলয়ে, আন্তঃধর্মীয় বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আহমদিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠী যে বহুমাত্রিক প্রান্তিকতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে, তাকে এই বৃহত্তর বাস্তবতার আলোকে অনুধাবন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আইনুন নাহার: অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: ainoon.naher@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[আলম] Alam, S. M. Shamsul (1995), The State, Class, Formation and Development in Bangladesh. Maryland, USA: University Press of America.

[আসাদ] Asad, Talal (1993) Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

[আসাদ] Asad, Talal (2003) Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. California: Stanford University Press.

[আহমেদ] Ahmed, Rafiuddin (1981), The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity, Delhi: Oxford University Press.

[কৌশিক] Kaushik, Surendra Nath (1996) Ahmadiya Community in Pakistan: discrimination, travail, and alienation. New Delhi: South Asian Publishers.

[গুয়ালটিয়ারি] Gualtieri, Antonio R (2004), The Ahmadis: Community, Gender, and Politics in a Muslim Society, McGill, Canada: McGill-Queen's University Press.

[গুহ] Guha, Ranajit (1996) The Small Voice of History in Amin, S and Chakrabarty, Depesh ed. Subaltern Studies IX: Writing on South Asian History and Society. Delhi: Oxford India Paperbacks.

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৯৫), মৌলবাদ ও বাংলাদেশ, উদ্ধৃত আলী রিয়াজ (সম্পাদিত), সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ, ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী।

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৯৬), আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

[ট্যালবট] Talbot, Ian (2005), 'Understanding Religious Violence in Contemporary Pakistan: Themes and Theories', in R. Kaur (ed.), Religion, Violence and Political Mobilisation in South Asia, New Delhi, India: SAGE Publications India Pvt Ltd, pp: 145-150.

[ডেভিস] Davis, Yuval-Nira (1997) Gender and Nation. New Delhi, India: SAGE Publications.

[দাস ও পুল] Das, Veena and Poole, Deborah (eds?) (2004), Anthropology in the Margin of the State, Delhi, India: Oxford University Press.

[নভিক] Novick, Peter in Pandey, Gyanendra (2001), Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[নাহার] Naher, Ainoon (2008), 'Gender, Religion and Development in Rural Bangladesh: An Examination of 'Fundamentalist' Backlash against Women's Participation in NGO Activities in the Early 1990s', VDM.

[মুনির] Munir Report (1954), Report of the Court of Inquiry Constituted under Punjab Act II of 1954 to Enquire into the Punjab Disturbances of 1953, Punjab, Pakistan: The Superindentent, Government Printing.

ফেরদৌস, সাঈদ (২০০৪), পশ্চিমের উদারনৈতিক হেজিমনিতে বসবাস: জিনিয়্যালজিস অফ রিলিজিয়ন-এর পাঠ-প্রতিক্রিয়া, সাভারঃ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।

[সাঈদ] Saeed, Sadia (2008), Pakistani Nationalism and the State Marginalisation of the Ahmadiyya Community in Pakistan, available at sociology.yale.edu/sites/default/files/sen_saeed.pdf (accessed 25 December 2014)

[সাঈদ] Said, E. (2001), Time for Intellectual Honesty: There Are Many Islams, available at lacan.com 1997/2001: http://www.lacan.com/said.htm

[হল] Hall, S ed 1997 Representaion: Cultural Representations and Signifying Practices. London, UK: SAGE Publications in assosiation with Miltion Keynes: The Open University.

[হাসান] Hasan, Perween (2011), 'Life and Living of Ahmadiya Muslim Jamaat in Bangladesh: An Unholy Alliance of Secular Politics and Religious Extremism', in A. Mohsin, and I. Ahmed (eds.), Women and Militancy: South Asian Complexities. Dhaka: The University Press Limited.

[হ্যানসন] Hanson, John H 2007 Jihad and the Muslim Community: Nonviolent Effrorts to Promote Islam in the Contemporary World in Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. Vol: 11. Issue: 2. Pp: 77-93. University of California Press.

অন্যান্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইট সংযোগঃ

http://alhafeez.org/rashid/overview.htm
http://www.irshad.org/quadianism/against.php
http://www.muslim.org/intro/ideo.htm
http://www.saag.org/common/uploaded_files/paper1252.html
http://www.mukto-mona.com/Articles/saleem/secular_to_islamic.htm
http://www.msapubli.com/affiliated/Html/categories/Jamiatul_ulama/bahmadi.html
http://www.thepersecution.org/dl/2010/annual_report2010.pdf.
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Bangladesh#cite_note-mgmpPRC-0
https://www.persecutionofahmadis.org/bangladesh-press-release-november-2012/
http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-1108&nid=29401#.UgefndI3DoI